



## নির্বাসনের কথা

মূল : এডওয়ার্ড সাইদ  
অনুবাদ : মুহম্মদ মুহসিন  
নির্বাসন এমন একটি বিষয়, যা ভাবনার জগতের জন্য অন্ধুতের নুভব জাগায়; কিন্তু অভিজ্ঞতার জন্য মর্মান্তিকতা ও বিভীষিকার কম্পন জাগায়। নির্বাসন একটি অমোচনীয় ফাটল, যা একটি মানুষকে তার মাটি থেকে চিরতরে আলাদা করে দেয়। একটি সত্তাকে তার অস্তিত্বের ভূমি থেকে বিতাড়িত করে দেয়। একটি জীবনের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো দুঃখ হয় না। নির্বাসিতদের নিয়ে রচিত গাথায় এবং ইতিহাসে আমরা যেসব

রোমান্টিক, বীরত্বব্যঞ্জক গৌরব কীর্তির কাহিনী পড়ে থাকি, সেগুলো মূলত নির্বাসনের জীবনবিদারী কণ্ঠকে জয় করারই এক ট্র্যাজিক চেষ্টার প্রকাশ। একজন নির্বাসিত যা হারায় নির্বাসিতের জীবনের কোনো প্রাপ্তিই কোনো দিন সেই হারানো সম্পদের তুলনায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পারে না।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, নির্বাসন যদি এমন এক স্থায়ী ও অপূরণীয় ক্ষতিই হবে, তাহলে নির্বাসন নিখড়িয়ে আধুনিক সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে এত ঐশ্বর্য ও শক্তি কিভাবে অর্জিত হলো? আমরা জানি যে আধুনিক যুগ আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ভ্রষ্ট। আধুনিক যুগ যন্ত্রণার এবং বিচ্ছিন্নতার। নিংশে আমাদের দেখিয়েছেন ঐতিহ্য আমাদের কী রকম অস্বস্তিতে ফেলেছে। ফ্রয়েড আমাদের দেখিয়েছেন আমাদের পারিবারিক অন্তরঙ্গতার মাঝে কিভাবে লুকিয়ে আছে আপত্তিকর যৌনতা। ঐতিহ্যের এই অস্বস্তি কিংবা অন্তরঙ্গতায় এই অস্বস্তি ভেতরে ভেতরে আমাদের নির্বাসনবোধ থেকে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতার উপজাত। এভাবে আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতির একটা বড় অংশই নির্বাসিত ও অভিবাসিতের কর্মের-ভাবনার ফসল। যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি ও নন্দনবোধের বর্তমান রূপটি তাদের দান, যারা ফ্যাসিজম, কমিউনিজম এবং এ জাতীয় দেশীয় নিগ্রহের ফলে ইউরোপ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল আমেরিকায়। সমালোচক জর্জ স্টিনার এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, বিশ শতকীয় পশ্চিমা সাহিত্যের একটি বড় শাখার নামকরণই হতে পারে Extraterritorial অর্থাৎ 'নির্বাসিতের সাহিত্য'। স্টিনার বলেন : প্রায় বর্বর এই সভ্যতা, যা অসংখ্য মানুষকে ছিন্নমূল করে দেয়, এই সভ্যতায় যাঁরাই শিল্পকলা চর্চা করেন তাঁরা সবাই নির্বাসিত কবি\_তাঁদের নিজের কোনো বাড়ি নেই\_নিজের কোনো ভাষা নেই।

ওপরের বক্তব্যের ধারায় নির্বাসনের বা দেশত্যাগের ইতিবাচকতা সাহিত্যে বা ধর্মে যদি

থেকেও থাকে তা পূর্বযুগীয়। আগের যুগে দুনিয়ার সব নির্বাসিতকে বা মোহাজেরকে নিজ ভাষার বাইরে এবং নিজ জাতির বাইরে গমনের একটি কল্পনা ও পরিকল্পনা ছিল। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশাও এক রকম ছিল। অভিজ্ঞতায় একরূপতা ছিল। রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী Herzen-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নির্বাসিত বুদ্ধিজীবীদের ওপর লিখিত ই এইচ কারের গ্রন্থ 'দ্য রোমান্টিক এঞ্জাইলস'-এ এ কথার প্রমাণ মেলে। আগের যুগের এই নির্বাসিতদের সঙ্গে বর্তমান যুগের নির্বাসিতদের পার্থক্য নির্বাসনের আয়তনে ও মানসিক পীড়নে। আজকের নির্বাসন ও নির্বাসিত দুনিয়া-বিস্তারী। আজকের সমর-আয়োজন, সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক থিওরিতে বিশ্বব্যাপী শাসন আকাজক্ষা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আজকের যুগটিই হলো নির্বাসিতের যুগ। অস্থানিক মানুষের যুগ এবং গণ-অভিবাসনের যুগ। মানুষ নিজের জন্য কিংবা মানবের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করছে এই ভাবনার আজ আর সুযোগ নেই। বিশ শতকীয় ঘটনার ধারায় আজকের নির্বাসন ও অভিবাসন কোনো নন্দনবোধ কিংবা মানববোধে উপলব্ধিযোগ্য নয়। সাহিত্য এই দেশত্যাগ ও নির্বাসনের এমন কিছু বেদনা ও সংকটকে চিহ্নিত ও চিত্রিত করছে, যা অনেককে শুরুতে আহত ও বিস্মিত করছে। কারণ দেশত্যাগ, নির্বাসন বা অভিবাসনকে অনেকেই এই বোধে গ্রহণ করে না বা করতে পারে না। কিছু একরূপ সংকটকে অনুভবযোগ্য করে তোলার মধ্য দিয়ে নির্বাসন বা অভিবাসন নন্দনবোধ তথা সাহিত্যের উপকার করছে এমন ভাবতে গেলে নির্বাসন বা অভিবাসন রক্তপাত ছাড়াই যে মানুষকে কেটে টুকরো টুকরো করছে, সেই ঘটনাকে তুচ্ছ করা হয়। এ ছাড়া এটা কি সত্য নয় যে নির্বাসন বা অভিবাসন নিয়ে ধর্ম ও সাহিত্যের ভাবনা নির্বাসনের অনেক ভয়ংকরকে চাপা দেয় বা ঢেকে ফেলে? এটা কি সত্য নয় যে মৃত্যুর মতো শক্তিশালী এই নির্বাসন লাখ লাখ মানুষকে তার বংশ, ইতিহাস ও মাটির সঙ্গে লাগানো নাড়ি থেকে ছিঁড়ে ফেলে? মৃত্যু তো অবশেষে জীবনকে ঈশ্বরের কৃপারাজ্যে পৌঁছে দেয়, কিন্তু নির্বাসন সেই কৃপা থেকেও বঞ্চিত করে।

নির্বাসিত সাহিত্যিকদের নিয়েই প্রথমে কথা বলা যাক। ধরা যাক নির্বাসিত কবিদের কথা। একজন নির্বাসিত কবি সত্যিকার অর্থে হয়ে থাকেন নির্বাসনের বিপ্রতীপ রূপ ও অবস্থাকে সয়ে নেওয়ার এক প্রতিমূর্তি। কয়েক বছর আগে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের সঙ্গে আমি কিছু সময় কাটিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সময় তিনি পাকিস্তান থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং বৈরুতে দিন পার করছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ফিলিস্তিনিরা ছিলেন তাঁর কাছের বন্ধু। কিন্তু আমি অনুভব করছিলাম যে যদিও তাদের একটি সহমর্মিতার ক্ষেত্র আছে, তার পরও ভাষা, কাব্যরীতি কিংবা জীবনৈতিহাসের কোথাও কোনো মিলনের বা ঐক্যের ভিত্তি তাদের মধ্যে নেই। ফলে একাকিত্বের বিষাদ তাঁকে সর্বদাই ঘিরে থাকত। একবারই দেখেছিলাম, যখন আরেক নির্বাসিত পাকিস্তানি ইকবাল আহমদ বৈরুতে এলেন; তখন ফয়েজ আহমেদ একমাত্র তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বিচ্ছিন্নতার স্থায়ী মন খারাপটুকু মুছতে পেরেছিলেন। আমরা তিনজন বৈরুতের একটি অপরিচ্ছন্ন রেস্টোরাঁয় গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা দিছিলাম। ফয়েজ কবিতা পড়ে যাচ্ছিলেন। একসময় তাঁরা আমার জন্য কবিতাগুলো আর অনুবাদ করছিলেন না। কিন্তু রাত যতই বাড়ছিল, আমি অনুভব করছিলাম; অনুবাদ ছাড়াই আমি বুঝে যাচ্ছি উর্দু কবিতা। মূলত আমি তখন আর কবিতার শব্দ বা ধ্বনি শুনছি না, বরং কবিতা দেখছি। আমি দেখছিলাম দুই নির্বাসিত যেন দেশে ফিরেছেন এবং চিৎকার করে বলছেন 'জিয়া-তুমি দেখ আমরা এখানে তোমাকে আমরা খোঁড়াই পরোয়া করি।' আমার এই দেখা কবিতার কোনো অনুবাদ দরকার হচ্ছিল না। রশীদ হুসাইন একজন ফিলিস্তিনি কবি। তিনি আধুনিক হিব্রু কবি বিয়ালিকের কাব্যকর্ম আরবিতে অনুবাদ করেছেন। তিনি ১৯৪৮ সাল-পরবর্তীকালের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী জাতীয়তাবাদী। তিনি নাসেরের ভাবধারা ও আরব জাতীয়তাবাদকে মেলাতে চেয়েছিলেন এবং এ লক্ষ্যে আরব ও ইহুদি লেখকদের

একবার একত্রে আলোচনায়ও বসিয়েছিলেন। একপর্যায়ে তিনি রাষ্ট্রীয় চাপ সহ্য করতে না পেয়ে দেশ ছেড়ে নিউইয়র্ক চলে গেলেন এবং এক ইহুদি মেয়ে বিয়ে করলেন। সেখানে জাতিসংঘের পিএলও অফিসে একটা চাকরি নিলেন। কিন্তু পিএলওর কর্তাস্থানীয়রা তাঁর নতুন নতুন চিন্তাধারায় রীতিমতো বিরক্ত ও নাখোশ হচ্ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি পাড়ি জমালেন আরব জগতে। সিরিয়া, লেবানন কিংবা কায়রোর সর্বত্রই মনে হলো, এ তো তাঁর ভূমি নয়। আবার ফিরলেন যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্র তাঁর দেহকে আশ্রয় দিলেও তাঁর মনের আশ্রয় যুক্তরাষ্ট্র নয়। তাঁর মনের আশ্রয় তো ছিল ইসরায়েলের সেই গ্রাম মুজমুজ, যেখান থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন। ফলে রশীদ হুসাইনের উদ্বাস্ত মনের বাস হলো মদে আর সিগারেটে। এই মদ ও সিগারেটেই তাঁর মৃত্যু হলো। তাঁর মৃতদেহ পেঁাছানো হলো তাঁর গ্রাম মুজমুজে। মৃত্যুর পর হলেও মুজমুজে ফিরে আজ হয়তো রশীদ হুসাইন ভালোই আছেন।

এমন অনেক কবি কবিতায় নির্বাসিতের জীবনের উচ্চারণে কবিতার মধ্য দিয়ে নির্বাসনকে একটি ট্রাজি-রোমান্টিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। কিন্তু সে হলো কবিতার দেওয়া বাস্তবের নিরিখে এক অভিশপ্ত মর্যাদা। মূলত নির্বাসন কোনো মর্যাদার বিষয় নয়। বরং নির্বাসন হলো মানুষকে তার পরিচিতির নিম্নতম মর্যাদাটুকু থেকেও বঞ্চিত করা। সুতরাং নির্বাসনের সংকট ও সমস্যা শুধু সাহিত্য দিয়ে পরিমাপের নয়। এর সংকট, সমস্যা, গ্লানির অনেক কিছুই সাহিত্যের জগতের বাইরে। নির্বাসন নিয়ে ভাবার সময়ে জয়েস বা নবোকভকে পাশে রেখে ভাবতে হবে সেই সব হাজারো উদ্বাস্ত মানবের জীবনের মানুষের কথা, যাদের জন্য জাতিসংঘের উদ্বাস্ত সংস্থাগুলো তৈরি হয়েছে। ভাবতে হবে সেই সব উদ্বাস্ত কৃষক ও শ্রমিকের কথা, যারা আর কোনো দিন ফিরতে পারবে না তার দেশের মাটিতে এবং চিরজীবন তাদের পরিচয় হবে একটি রেশন কার্ড এবং জাতিসংঘের উদ্বাস্ত সংস্থার দেওয়া একটি সংখ্যা। নির্বাসন নগরী প্যারিসের ভুবনজোড়া খ্যাতির হাতেগোনা কয়েকজন নির্বাসিত ছাড়াও যে রয়েছে জন্মভূমি থেকে চির-বিচ্ছিন্ন ভাগ্যহত অজস্র ভিয়েতনামি, আলজেরীয়, কম্বোডীয়, লেবাননি কিংবা সেনেগালীয় যুবক-যুবতী তাদের কথা ভাবতে হবে। এমন সব নির্বাসন নগরী কায়রো, বৈরুত, মাদাগাস্কার, ব্যাংকক কিংবা মেঙোঁকা সিটির কথা ভাবতে হবে। আর আটলান্টিক থেকে যত পশ্চিমে যাওয়া যাবে মাতৃভূমিহীন জীবনের যন্ত্রণা চোখের সামনে ততই বাড়বে। দেখা যাবে মানুষ আর মানুষ, যাদের কোনো অতীত-ভবিষ্যৎ নেই\_যাদের কোনো নাম-ধাম-ঠিকানার কাগজ নেই। তারা নিজেরা ছাড়া তাদের আজ সব কিছুই হারিয়ে গেছে। নির্বাসন বা দেশত্যাগের আলোচনায় জাতীয়তাবাদ একটি আবশ্যিক প্রসঙ্গ। জাতীয়তাবাদ মানে একটি স্থান, জাতি এবং একটি ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখার লড়াই। জাতীয়তাবাদ জোর গলায় বলে সেই স্বদেশের কথা, যার ভিত্তিভূমে রয়েছে একটি ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রথাবদ্ধ সামাজিক আচার। এই বলার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ বিরোধিতা করে সব নির্বাসন বা দেশত্যাগমূলক কর্মকাণ্ডকে এবং বাধা দেয় নির্বাসনের সব ধ্বংস প্রক্রিয়াকে। তবে আশ্চর্যজনক সত্য হলো, মূলত জাতীয়তাবাদের মধ্যেই নিহিত থাকে নির্বাসনের সব প্রক্রিয়ার বীজ। হেগেলীয় মনিব-ভৃত্য ডায়ালেটিকসে যেমন মনিব-ভৃত্য পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও মূলত একে অপরের জন্য দায়ী, তেমনি নির্বাসন এবং জাতীয়তাবাদ পারস্পরিক বিরোধী হলেও একে অপরকে সৃষ্টি করে। প্রথমত, জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিই একটি গোষ্ঠীকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত। আমেরিকার স্বাধীনতা, জার্মানি বা ইতালির একত্রীকরণ কিংবা আলজেরিয়ার মুক্তি\_এমন সব ঘটনাই মূলত আগে যেখানে ছিলাম কিংবা যাদের সঙ্গে ছিলাম, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রাম এবং এক অর্থে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে নির্বাসিত হওয়ার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে বিজয়ী হলে অর্জিত জাতীয়তাবাদ ভূতাপেক্ষিকভাবে এবং ভবিষ্যতের গর্ভজুড়ে নৈতিক

মর্যাদায় নির্বাচিত ঘটনার নির্ধারিত অর্থ দিয়ে গড়ে তোলে এক ইতিহাস। এই ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় জাতীয়তাবাদের আখ্যান। এই আখ্যানে থাকে জাতির জনকের কথা, থাকে ধর্মজ্ঞানের মতো পবিত্র কিছু মূলমন্ত্র, থাকে কী তাদের আঁকড়ে থাকার বিষয়, সেই সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত কিছু শব্দমালা, থাকে তাদের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সাফল্যসূচক ঘটনা বা বিজয়স্তুম্ভসমূহ; এবং আরো থাকে কারা বন্ধু এবং কারা তাদের নেতা\_এ সম্পর্কিত উচ্চারণ।

জাতীয়তাবাদের এ আখ্যানকেই Pierre Bourdieu বলেছেন Habitus। জাতীয়তাবাদের সফল সীমানায় পৌঁছেলে সংশ্লিষ্ট জাতি মনে করে, সব সত্য হলো তা, যা তারা ভাবে বা করে এবং সব মিথ্যা হলো তা, যা অন্যরা ভাবে বা করে। যেমনটা পুঁজিবাদীরা ভাবে সমাজতান্ত্রিকদের কিংবা ইউরোপীয়রা ভাবে এশীয়দের। কোনো জাতির এই 'তারা' (জাতির নিজ ভাষায় 'আমরা') এবং 'অন্যরা' প্রত্যয়দ্বয়ের মাঝে যে সীমানাসূচক রেখাটি রয়েছে, সেই রেখায় থাকে তারা, যাদের আঁকড়ে ধরার কিছু নেই কিংবা যাদের কাছ থেকে আঁকড়ে ধরার সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে; এবং এরাই হলো এক শব্দে 'নির্বাসিত'। আদিম যুগে এই রেখায় জনকে বা জনগোষ্ঠী নির্বাসন দেওয়া হতো। আর আধুনিক যুগে এই রেখায় জমতে থাকে শরণার্থী নামের মানুষেরা কিংবা পা থেকে মাটি কেড়ে নেওয়া মানুষেরা, অর্থাৎ নির্বাসিতরা।

জাতীয়তাবাদীরা একেকটি দল। নির্বাসন হলো সেই দলহারা একাকিত্ব। এই একাকিত্বে পতিত হলে জাতি থেকে একাকিত্বে পতিত লোকটির দূরত্ব বাড়ে না, বরং বিপরীতভাবে জাতীয় গৌরবের সব বিষয়, জাতীয় মনোভঙ্গি এবং সাকল্যে জাতির প্রতি নাড়ির টানটি তার আরো দুর্মর হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় কি প্রশ্ন জাগে না জাতীয়তাবাদ ও নির্বাসনের মাঝে অনেক অভিন্ন চরিত্র বিদ্যমান? তারা কি পরজাতি বিদ্বেষের দুটি বিপরীত শ্রোত নয়? এ জিজ্ঞাসাগুলোর কোনো চূড়ান্ত উত্তর নেই। কারণ এ জিজ্ঞাসাগুলোর প্রতিটি ধরে নেয়, নির্বাসন ও জাতীয়তাবাদের আলোচনা হতে হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে, একটিকে অপরটির সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত না করে। কিন্তু সেই বিযুক্তিই তো কখনো সম্ভব নয়। তবে একটি মাত্র জায়গায়ই তাদের আলাদা করে এ কথা বলা যায়, জাতীয়তাবাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছুই নির্বাসিতের সংকটকে একবারও ছুঁয়ে যায় না।

জাতীয়তাবাদ জীবনের একটি ধারাবাহিকতা। কিন্তু নির্বাসন সেই ধারাবাহিকতার ছেদ। নির্বাসিত তার শিকড়, তার ভূমি এবং তার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন। নির্বাসিতের রাষ্ট্র নেই, প্রতিরক্ষা বাহিনী নেই। তবে নির্বাসিতরা এই শেষোক্ত দুইয়ের অর্জনের জন্যই চেষ্টা করে। নির্বাসিতরা বোধ করে, তাদের ভাঙাচুরা জীবনগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে এক করতে হবে। এ লক্ষ্যে পেছনকে পেছনে ফেলে অনেক সময়ই তারা বেছে নেয় এমন কোনো আদর্শকে, যে আদর্শ বিশ্বের বুকে বিজয়ী রূপে বর্তমান। বিজয়ীর আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের তলে দাঁড়িয়ে এক হয়ে দাঁড়ানো কার্যত সম্ভব নয় বলেই দূর থেকে এনে হলেও কিংবা ধার করে এনে হলেও নির্বাসিতরা এই পথে জাতীয় পুনর্গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। ইহুদি, ফিলিস্তিনি কিংবা আর্মেনীয়দের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেও এ বক্তব্যের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নৌবর একজন বিচ্ছিন্ন আর্মেনীয়। ১৯১৫ সালে তাদের পরিবারের ওপর ভয়ংকর অত্যাচার নেমে আসে। তার মাতামহকে হত্যা করা হয়। এ পরিস্থিতিতে তার মা-বাবাকে পূর্ব তুরস্ক ছাড়তে হয়। তার মা-বাবা আশ্রয়ের সন্ধানে নামেন। প্রথমে আলেপ্পোতে, পরে কায়রোতে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে মিসরে অমিসরীয়দের জন্য থাকাটা কঠিন হয়ে ওঠে। তার মা-বাবা চার সন্তানসহ একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থার সহায়তায় বৈরুতে পাড়ি জমান। ত্রাণ সংস্থাটির ভাতার ওপর নির্ভর করে দুই রুমের একটি

ঘরে গাদাগাদি করে বাস শুরু হয় নৌবরের পরিবারের। তারপর একসময় তাদের হাতে কোনো অর্থ থাকে না এবং অপেক্ষা শুরু হয় কোনো ত্রাণ সংস্থার সুদৃষ্টির ওপর। আট মাস পর একটি ত্রাণ সংস্থা তাদের গ্লাসগো যাওয়ার জন্য কয়েকটি বিমান টিকিটের ব্যবস্থা করে। এভাবেই পরবর্তীকালে নৌবরের পরিবার পেঁাছে গান্ধারে এবং শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কে। গ্রেহাউন্ড বাসে করে তারা রওয়ানা হয় নিউইয়র্ক থেকে সিয়াটলে। আমি নৌবরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা শেষ পর্যন্ত সিয়াটলে যাচ্ছ? নৌবর হাসল; এবং হাসিতেই বোঝাল, আর্মেনিয়ার চেয়ে সিয়াটলই ভালো। এভাবে অতীত কেটে দিয়ে নির্বাসিতরা বিজয়ীর আদর্শে একত্রিত হওয়ার লক্ষ্যে আত্মবিসর্জন দেয়।

নির্বাসিতের জীবনে কোনো কিছুই নিরাপত্তা নেই। তাই নির্বাসিতের জীবনদৃষ্টিটি হিংসার। নির্বাসিতদের কেউ কিছু পেলে স্বার্থপরতার মতো তা একক ভোগের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এই স্বার্থপরতা থেকে তাদের মধ্যে তৈরি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের কঠিন ঐক্য এবং অন্যের প্রতি কঠিন হিংসা। এমনকি একই রকম সংকটে পতিত অন্য দলের প্রতিও হতে পারে নির্বাসিতের এই হিংসা। ফিলিস্তিনি ও ইহুদিবাদী ইসরায়েলিদের হিংসা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফিলিস্তিনিরা মনে করে, তারা আজ উদ্বাস্তু ইহুদিদের কারণে, যে ইহুদিরা নিজেরাই ছিল স্বরণকালের দুর্গততম উদ্বাস্তু। অর্থাৎ উদ্বাস্তুরাই উদ্বাস্তুদের হিংসার শিকার। আবার ফিলিস্তিনিরা আজ জানে, তাদের জাতীয়তার ঐক্যে আজকের যে জাগরণ, সেই জাগরণ মূলত তাদের এই উদ্বাস্তু জীবনের দান। উদ্বাস্তু জীবনে পেঁাছে তারা প্রথম বুঝেছে, তাদের 'আমরা' কারা। আজ তারা বোঝে, তাদের যারা সহমর্মী, সেই ত্রাণ সংস্থার লোকেরাও তাদের 'আমরা' নয়। তারা বোঝে, এই 'আমরা' থেকে কারো বেরিয়ে যাওয়া কতটা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়।

নির্বাসিতদের ইতিহাসে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে করুণ ঘটনা যে একটি জনগোষ্ঠী আরেকটি নির্বাসিত জনগোষ্ঠী দ্বারা নির্বাসিত হচ্ছে। স্বদেশহারা একটি জনগোষ্ঠী সুবিধাপন্নতায় পেঁাছে আরেকটি জনগোষ্ঠীকে স্বদেশহারা করছে। ১৯৮২ সালের গ্রীষ্মে সব ফিলিস্তিনির মনে একটি জিজ্ঞাসা ছিল, ইসরায়েলিরা ১৯৪৮ সালে আমাদের দেশছাড়া তো করলই, এরপর আজ লেবাননের শরণার্থী শিবিরগুলো থেকেও কেন তারা আমাদের তাড়াচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত এই যে, ইহুদিরা তাদের বসতির কাছাকাছিও কোনো উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর বাস সহ্য করতে পারছিল না। কারণ সেসব উদ্বাস্তুকে দেখলেই তো তাদের নিজেদের উদ্বাস্তু-জীবনের যন্ত্রণার কথা অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়। ইসরায়েলিদের এই সহ্য করতে না পারাটা দিন দিন বেড়ে ফিলিস্তিনি জাতীয়তার এক স্থায়ী শত্রুতায় পরিণত হয়। আজ এই ৪৬ বছর যাবৎ ফিলিস্তিনিরা জাতীয়তায় আবদ্ধ হতে চেষ্টা করছে আর ৪৬ বছর ধরে বাড়ছে ইসরায়েলি শত্রুতা।

ফিলিস্তিনিদের নির্বাসিত জীবনের অনেক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে জাতীয়তার অঙ্কুরোদগমের এই চেষ্টা দৃশ্যমান মাহমুদ দারবিশের কবিতায়। তাঁর কবিতা হারানোর ব্যথাকে প্রাপ্তির আরাধনা বেদিতে পেঁাছে দেওয়ার এক মহাকাব্যিক প্রয়াস। তাই তো তাঁকে দেখি, তিনি ভিটা হারানোর দুঃখকে সাজ না হওয়া কতগুলো কাজের তালিকায় প্রকাশ করেন এবং একটি অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন যে এ কাজগুলোকে উপসংহারে নিয়ে যাওয়ার একটি দায় আছে—

আমি নির্বাসিত

তোমার চাহনি আমার শরীরে এক সিলমোহর।

আমাকে নিয়ে যাও যেখানে খুশি

আমাকে নিয়ে যাও তুমি যে-ই হও।

শুধু আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার চেহারার রং

ফিরিয়ে দাও আমার শরীরের উষ্ণতা

ফিরিয়ে দাও আমার চোখের ও হৃদয়ের আলো  
ফিরিয়ে দাও আমার রুটির লবণটুকু  
ফিরিয়ে দাও আমার ভূমির, আমার মাতৃভূমির  
স্বাদটুকু।

এক কথায়, নির্বাসন বলতে দেশে ফিরতে বাধা দেওয়াকে বোঝালেও নির্বাসনের বিভিন্ন রূপ, যেমন নির্বাসিত, শরণার্থী, দেশত্যাগী, অভিবাসী ইত্যাদির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর মূলে রয়েছে অবশ্যই আদি ঘটনা, অর্থাৎ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। যার দেশ ছাড়তে হলো, তার শুরু হলো দুর্দশার জীবন এবং পরদেশি নামের কলঙ্কময় জীবন। নির্বাসনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে শরণার্থী রূপটি একেবারেই বিংশ শতকীয় একটি রূপ। 'শরণার্থী' (Refugee) শব্দটি অনেকটা রাজনৈতিক শব্দ, যা মনে করিয়ে দেয় একদল দেশহারা নিদোষ মানুষকে, যাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু 'নির্বাসিত' (Exile) শব্দটি একটু ভিন্ন মাত্রার, যার সঙ্গে একাকিত্ব এবং অন্তর্গত বেদনার বিষয়গুলো বেশি প্রাসঙ্গিক।

দেশত্যাগীরা (Expatriate) স্বেচ্ছায়ই ব্যক্তিক বা সামাজিক পটভূমিতে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস করে। হেমিংওয়ে কিংবা ফিটজেরাল্ডকে কেউ ফ্রান্সে বাস করতে বাধ্য করেনি। দেশত্যাগীরা নির্বাসিতদের নিঃসঙ্গতার অনেক তীব্রতা অনুভব করতে পারে। তবে তারা নির্বাসিতদের নিষেধ-তালিকার অনেক কিছুই বাইরে। অভিবাসীরা একেবারেই আলাদা। উপনিবেশের স্বার্থে উপনিবেশিকরা অনেকে অভিবাসী হতো। তারা নিঃসঙ্গতার কষ্ট কিছু পেলেও তাদের তো কেউ নির্বাসন দেয়নি। একইভাবে সাদা ইউরোপীয়, যারা অস্ট্রেলিয়া বা আফ্রিকায় স্থায়ী হয়েছে, তারা অভিবাসী হলেও 'নির্বাসিত' (Exile) শব্দটি তাদের সঙ্গে একেবারেই যায় না। একজন নির্বাসিত তার হারানো ভূমির ক্ষতিপূরণে চেষ্টা করে নতুন ভূমি সৃষ্টির জন্য, যে ভূমিতে থাকবে তার শাসন। এই নতুন ভূমি সৃষ্টির চেষ্টার ফলাফল হিসেবেই নির্বাসিতদের অনেকেই বড় মাপের উপন্যাসিক, দাবাড়ু, রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবী। এ ক্ষেত্রগুলোর নির্বাসিতদের আগ্রহ বেশি এ কারণে যে নির্বাসিতরা স্বাভাবিকভাবেই গরিব হয়ে থাকে এবং খালি পকেটে এসব ক্ষেত্রেই যা কিছুটা সুবিধা করা যায়; অন্যত্র নয়। নির্বাসিতের সৃষ্ট জগৎ প্রায় এক অবাস্তব জগৎ এবং এই অবাস্তবতা উপন্যাসের জগতের বাস্তবতা মনে করিয়ে দেয়। গিয়র্গ লুকাস 'থিয়রি অব দ্য নভেল' গ্রন্থে বলেছেন, উপন্যাসের বাস্তবতা দেশহারা অনুভবের অতীন্দ্রিয় পর্যায়ের (Transcendental Homelessness) মূর্তায়ন। লুকাস বলেন, মহাকাব্য ও উপন্যাসের পার্থক্য হলো মহাকাব্য তৈরি হয় এমন ভূমিতে, যেখানে সংস্কৃতি থিতু হয়েছে, মূল্যবোধ স্থায়ী রূপ পেয়েছে এবং জীবন পরিবর্তনশীলতা রোধ করেছে। পক্ষান্তরে উপন্যাস হলো সেই ভূমির নির্মিতি, যে ভূমির অবস্থা পুরো উল্টো রূপ। বিশেষ করে ইউরোপীয় উপন্যাসগুলোর নির্মিতি সেই ভূমিতে, যেখানে একটি অস্থির আদিবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত সমাজ চেষ্টা করে চলেছে একটি নতুন ভূমি নির্মাণের, যা মূলত ধারণ করবে ফেলে আসা আদি ভূমিরই ছায়া। উপন্যাসের নির্মিতি এমন একটি দ্বিতীয় ভূমি। কিন্তু মহাকাব্যে এমন কোনো দ্বিতীয় ভূমির স্থান নেই। মহাকাব্যের ভূমি অদ্বিতীয়ভাবে একটি, যা স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। অডিসিউস দীর্ঘ পরিভ্রমণ শেষে সেই স্থায়ী ভূমি ইথাকায় পৌঁছেন। একিলিসকে মরতে হয়। কারণ তিনি সেই স্থায়ী ভূমিতে পৌঁছতে পারেননি। উপন্যাস বেঁচেই আছে এই প্রাকল্পিক ধারণার ওপর যে একটি দ্বিতীয় বা বিকল্প ভূমি আছে। উপন্যাসের এই দ্বিতীয় ভূমি আর দেশত্যাগী এবং নির্বাসিতদের বিকল্প ভূমি আদতে অভিন্ন।

নির্বাসিতরা যত ভালো অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তারা সব সময় মনে করে, তাদের স্বাতন্ত্র্যগুলো হলো একজন ইয়াতিমের স্বাতন্ত্র্য এবং সেই ইয়াতিমিপনাকে তারা ব্যবহারও

করে। এই স্বাভাব্যকে অপ্ৰের মতো ব্যবহার করে তারা জেদি মনোভাবের সঙ্গে মনে করে, তাদের অধিকার আছে কোনো কিছুকে আঁকড়ে না ধরার। এ থেকে অনেক সময় তৈরি হয় অপরকে সহ্য না করার গোয়ারত্ব। খামখেয়ালিপনা, অতিরঞ্জন, অতিশায়ন ইত্যাদি নির্বাসিতের জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। এগুলো দ্বারা অপরকে তারা চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে গ্রহণ করাতে বাধ্য করতে চায়। চরমতাকে দাবিয়ে প্রশান্তি ও স্নিহতা নির্বাসিতের কর্মে আসতেই চায় না। নির্বাসিত শিল্পীরা চূড়ান্তভাবেই আমাদের অনুভূতির ওপর একটি ধাক্কা। তাদের জেদীপনা তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মগুলোর ওপরও কটমট চোখে তাকিয়ে থাকে। 'ডিভাইন কমেডি'র প্যারাডাইস পর্ব যেখানে স্বর্গীয় শান্তির এবং পরমানন্দের বাইরে আর কিছু থাকার কথা নয়, সেখানেও দেখা যায় ইনফার্নোর প্রতিহিংসা এবং বিচারের অত্যাচার উঁকি দিচ্ছে। ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত দান্তে স্বর্গের খোদায়ি জগৎ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন তাঁর ফ্লোরেন্স হারানোর যন্ত্রণা।

জেমস জয়েস নির্বাসিতের জীবনভাবনাকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন। এই ভাবনায় তিনি তাঁর লেখকবৃত্তিকে শাণিত করেছিলেন। জয়েসের জীবনীগ্রন্থে রিচার্ড এলম্যান বলেছেন, জয়েস আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে একটি দ্বন্দ্ব স্ব-উদ্যোগে তৈরি করে সেটাকে জিইয়ে রাখতেন আয়ারল্যান্ড থেকে নির্বাসিত এমন একটি অনুভবকে তাঁর মাঝে কার্যকর রাখার জন্য। এই দ্বন্দ্ব মিইয়ে যেতে বসলে কিংবা মিটমাট হতে গেলে আবার নতুন কোনো ঘটনা দ্বারা সেটাকে মানস রাজ্যে শাণিত করে নিতেন। এভাবেই জয়েসের উপন্যাস বহন করে অস্তিত্বের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা। এমন নির্বাসিতের জীবন অনুভবকে জীবনের জন্য নির্বাচন করাটা খুব সাধারণ ঘটনা না হলেও জয়েস সেই অসাধারণের চর্চা করেছেন। তবে জয়েসের এই চর্চা একটি কঠিন প্রশ্ন তোলে। জয়েসের চর্চা কি প্রমাণ করে না, নির্বাসন আদতে এত ব্যক্তিগত একটি বিষয় যে জাতীয়ভাবে এটাকে খুব বড় করে দেখার সুযোগ কম। এ বাস্তবতায় বর্তমানে নির্বাসন সম্পর্কে এমন একটি ধারণাও অনেকের মধ্যে দেখা যায়, অনির্বাসিতরাও নির্বাসিতদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে আত্মপকারে ব্যবহার করছে। এ বক্তব্যের কিছুটা সত্যতাও রয়েছে। মধ্যযুগীয় পরিব্রাজক পণ্ডিতদের মতো তারাও পরিবেশকে কিছুটা সমৃদ্ধি দেয়। এগুলোর ভিত্তিতে অনেক সময়ই আমরা নির্বাসিতদের আলোকদায়ী ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে দেখি এবং তাদের দুর্দশাকে আমলে কম নিই। কিন্তু সাহিত্য জগতের বাইরে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখলে নির্বাসিতদের ঘরহারা বা দেশহারা জীবনের ট্রাজিক দুর্ভাগ্য এবং নির্দয় জগতের তাদের প্রতি করুণ অবহেলা বেশি চোখে পড়বে।

এক প্রজন্ম আগে সাইমন ভিল নির্বাসিতদের সংকট নিয়ে খুব সংক্ষেপে সুন্দর কিছু কথা বলেছিলেন। ভিল বলেছিলেন, স্বদেশের মাটির সঙ্গে শিকড়টি ধরে রাখতে পারাটা মানুষের আত্মার জন্য সবচেয়ে কম মূল্যায়িত অথচ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়োজন। তিনি আরো দেখিয়েছিলেন, এই বিশ্বযুদ্ধ, গণহত্যা ও নির্বাসনের যুগে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্নকরণের বিরুদ্ধে যেসব উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে, তা বিচ্ছিন্নকরণ বা নির্বাসন-প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক সময়ই কম জঘন্য নয়। নির্বাসন মোকাবিলায় সেসব ব্যবস্থার একটি হলো রাষ্ট্রবাদীব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার জঘন্যতা হলো রাষ্ট্র এমন এক বন্ধন দাবি করে যে সেই বন্ধনের দাবিতে রাষ্ট্র তার জনগণের অন্য সব বন্ধন কেটে দিতে দ্বিধা করে না।

ভিল নির্বাসনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা যেসব অপ্রতিরোধ্য চাপ ও অষ্টোপাস-বেষ্টনীর কথা বলেছেন, সেগুলোর নিরিখে নির্বাসিতদের জীবনকে ট্রাজেডি ব্যতীত অন্য কোনো শব্দে বা ধারণায় ব্যক্ত করা যায় না। নির্বাসিতের বিচ্ছিন্নতা এবং বিভূঁইয়ের জীবন তার ভেতর এক আত্মপীড়নের বোধ জাগিয়ে তোলে, যা তাকে আত্মবিকাশ বা সাংস্কৃতিক সম্মোহন থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তখন নির্বাসনই তার চাওয়া হয়ে ওঠে এবং সব মানবিক প্রতিশ্রুতি থেকে সে দূরে সরতে থাকে। তখন জীবন এমন হয়ে ওঠে যে এর চারপাশের সব কিছুই বড় অস্থায়ী এবং তুচ্ছ মনে হয়। তখন কোনো কিছুর প্রতিই আর ভালো লাগার বোধ জাগে না।



তখন জাতীয় আন্দোলনে যোগদানও বাজে এবং বোঝা মনে হয়ে উঠতে পারে। এটাও বিবেচনার বিষয় যে রক্ষণমূলক জাতীয়তা নির্বাসিতদের মধ্যে আত্মচেতনা জাগায় এবং একইভাবে জাগায় নিজেকে জাহির করার প্রবণতা। সেখান থেকে জাগে জাতিরূপে একত্রিত হওয়ার প্রয়াস। তার জন্য দরকার হয় জাতীয় ইতিহাস, প্রাচীন ভাষা, ঐতিহ্য এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান; যেমন গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এর মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বোধ এবং তাঁরও ভেতর দিয়ে আত্মানুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় 'এথনিসিটি'র বিষয়বোধ ও ভাবনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এ বাস্তবতার নিরিখেই আমি বলব, পরদেশে বাস কোনো সুবিধা নয়। এটা শুধু অনেক দিক দিয়ে আধুনিক, সেসব অবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের একটি, যা আধুনিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ বা শাসন করছে। প্রবাস বা নির্বাসন কোনো চাওয়া নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই নিয়তি-নির্দিষ্ট অবস্থা। নির্বাসিত জানে, এই অনিশ্চিত জগতে সব নিবাসই বড় সাময়িক বাস। দেশের সীমারেখা আর প্রতিবন্ধক দেয়াল দ্বারা যেমন নিরাপত্তার বলয় তৈরি হয়, তেমনি তাদের দ্বারাই বন্দিখানার জিজিরও তৈরি হয়। নির্বাসিতরা সেই সীমারেখা ও দেয়াল ভেঙে বের হয়। সেই দেয়ালের সঙ্গে তারা ভাঙে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার দেয়াল।

স্যাঙ্গিনর এক ধর্মীয় পুরুষ হুগো এ প্রসঙ্গে কতকগুলো চমৎকার কথা লিখেছিলেন। হুগো লিখেছিলেন: "অনুশীলনার্থী মনের জন্য এটি একটি আনন্দের উৎস যে এই মন অল্প অল্প করে এগোবে। প্রথমে অদৃশ্য ও অসহনীয় বস্তুগুলো নিয়ে মনের পরিবর্তন ঘটাবে এবং ধীরে ধীরে পেছনের সব কিছুই পেছনে ফেলে দেবে। যে এখনো মাতৃভূমিকে মমতাময় মনে করে, তার যাত্রা এ পথে প্রায় শুরুই হয়নি বলা যায়। যেকোনো দেশকে নিজের মনে করতে পারে, সে বেশ কিছু দূর এগিয়েছে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আর গন্তব্যে পৌঁছেছে সে, যে বুঝে গেছে সারা দুনিয়াই তার জন্য প্রবাস এবং বিদেশ-বিভূই। যার যাত্রা কেবল শুরু হয়েছে, তার ভালোবাসা একটি ভূমিতে। আর যে কিছু দূর এগিয়েছে, তার ভালোবাসা সব ভূমিতে। আর যে গন্তব্যে পৌঁছেছে, সে ধ্বংস করতে পেরেছে সব ভালোবাসা।"

বিশ্বযুদ্ধকালে তুরস্কে বসবাসরত নির্বাসিত বা প্রবাসী এরিখ আউরবেখ এই বাক্যগুলো উদ্ধৃত করে উৎসাহ দিয়েছিলেন তাদের, যারা জাতীয় এবং দেশিক সীমারেখা থেকে বের হতে আগ্রহী। এই মনোভাব ধারণ করে একজন ঐতিহাসিক বুঝে উঠতে পারেন, মানব অভিজ্ঞতার ইতিহাস এবং সেই অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা ও এককতা। এই হুগোর বাক্যগুলোতে একটি বিষয় স্মরণ্য। হুগোর বর্ণিত তৃতীয় ধাপে যেখানে ব্যক্তি পূর্ণতায় বা গন্তব্যে পৌঁছে, সেখানে পৌঁছতে হলে ভালোবাসা বিসর্জন দিতে হয়। তবে তাঁর জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরের ভালোবাসার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। শুরুতেই সব ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান হলে পথ চলাটাই শুরু হয় না। সে সূত্রেই বলতে হয়, নির্বাসন বা প্রবাসের ভিত্তি স্বদেশের মাটির প্রতি ভালোবাসা বা বন্ধনটির অস্তিত্ব। স্বদেশটি হারিয়েছে—এই হারানোর বোধটাই ঘোষণা করে, স্বদেশটির সঙ্গে আছে একটি শক্তিশালী বন্ধন। নির্বাসনের ভালো দিকও আছে—এমন ধারণা করাটা যদিও কিছুটা খটকা লাগায়, তার পরও ভালো মনে হয় এমন দিক কিছু খুঁজলে পাওয়া যাবে। সারা পৃথিবীকে নিরাসক্তভাবে বিদেশ হিসেবে দেখতে পারার মধ্যে নির্বাসিতের দৃষ্টিরেখা প্রসারিত হয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ এক দেশ, এক সংস্থা এবং এক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন। প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাসিতরা অন্তত দুটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন। দৃষ্টিরেখায় এই বহুত্ব একই সঙ্গে ভাবনায় ও মননে বহুমাত্রিকতা আনয়ন করে। সংগীতের সুরের মিশ্রণে যে মুছনা জাগে, দৃষ্টিরেখায় এই বহুত্ব মননে তেমন মুছনের সঞ্চার করে। প্রবাসের বর্তমান ও অতীতের স্বদেশ একত্রে জাগরুক থাকে। এমন অনুভবও সম্ভব হয় যে নির্বাসিত প্রবাসেই স্বদেশে বাসের আনন্দ আশ্বাদ রাখে।

তবে এই ভাবনাজাত অলীক আশ্বাদে আশঙ্কাও থাকে। 'নাই'-এর মাঝে 'আছে' কল্পনার এই মূর্তায়ন এবং এর আশ্বাদ দেহ ও মন—দুইয়ের জন্য বড়ই কষ্টকর ও ক্লান্তিকর। ফলে



শান্তি, সন্তুষ্টি ও ভালো লাগার জায়গা প্রবাস বা নির্বাস কখনোই নয়। ওয়ালেস স্টিভেন্সের শব্দে প্রবাস হলো মনোরাজ্যের স্থায়ী শীতকাল, যেখান থেকে হেমন্ত ও বসন্তের ঐশ্বর্য খুব কাছ থেকেই দেখা যায়, কিন্তু কখনো হাতে পাওয়া যায় না। এ কথাই এভাবে বলা যায়, নির্বাসিতের জীবন এক আলাদা দিনপঞ্জিতে চলে। স্বদেশের জীবনে যেভাবে ঋতু আসে, এই জীবনে সেভাবে ঋতুরা আসে না। [সিঁথু সংক্ষেপিত]

[www.amarboi.com](http://www.amarboi.com)